দুর্নীতির উৎস কোথায়?

দুর্নীতি। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে সবচেয়ে আলোচিত প্রসঙ্গ। তবে এই মুহূর্তে আলোচনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এত দিন দুর্নীতির আগাগোড়া-ডালপালা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন আলোচিত হচ্ছে দুর্নীতি দমনের প্রসঙ্গ। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ বিষয়ে দেশের ও বহির্বিশ্বের সর্বোচ্চ মনোযোগের কেন্দ্র হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক। এর চেয়ারম্যান সাবেক সেনা প্রধান লে: জে: (অব:) হাসান মশহুদ চৌধুরীর মত তড়িৎকর্মা ও সাহসী ব্যক্তির কল্যাণে দুদক এরই মধ্যে ডজন ডজন বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদ-আমলা ও ব্যবসায়ীকে জেলে পুরতে সক্ষম হয়েছে; যদিও শীর্ষ রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার এবং শেখ হাসিনা-খালেদা জিয়াকে নিয়ে সরকারের অস্থির মনোভাব দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে নানা রকম প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে তারপরও জনগণ এখনও সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে মৌন হলেও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক দশকের দুর্নীতির কারণে অতিষ্ঠ ও ত্যক্ত বিরক্ত জনগণ এখন যেকোন মূল্যে দুর্নীতির এই চক্র ভেঙ্গে ফেলতে মরিয়া। সরকারের রাজনৈতিক উচ্চাশা, পরাশক্তিগুলোর সাথে সম্পর্ক, তেল- গ্যাস-কয়লা-বন্দর-ট্রানজিট-বিদ্যুৎ নিয়ে সরকারের অস্বচ্ছ মনোভাব, মানবাধিকার, ভবিষ্যৎ রাজনীতি, নির্বাচন, জাতীয় উন্নয়ন, ক্রমবর্ধমান বাজার দর ইত্যাদি নিয়ে জনমনে নানা রকম শংকা ও প্রশ্ন থাকলেও ফালু-মামুন-নাসিম গংদের উচিত শিক্ষা হচ্ছে ভেবে জনগণ এখন আনন্দিত। দুদক-যৌথবাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানে শুধু যে দুর্নীতিবাজ ধরা পড়েছে তা নয় বরং সাথে সাথে দুর্নীতির অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাও জনসমক্ষে প্রকাশ পাচ্ছে। যার সর্বশেষ নজির হচ্ছে সরকারের প্রধান বন সংরক্ষকের আটকপরবর্তী রূপকথার মত ঘটনাবলী। একজন সরকারী কর্মকর্তা, যার বেতন সর্বোচ্চ বিশ পঁচিশ হাজার টাকা তার বালিশের ভেতর সতের লক্ষ টাকা, ড্রামের ভিতর এক কোটি টাকা ব্যাংকের লকারে তিনশ’ ভরি সোনা উত্তরা কাফরুল গুলশানে বাড়ি- ফ্লাট, দেশের বিভিন্ন যায়গায় ২৫০ বিঘা জমি, শ্বশুরের কোটি টাকার কাঠ জনগণকে হতবাক করে দিয়েছে। এর আগে আমরা অবাক হয়ে দেখেছি ত্রাণের টিন মাটির নীচে, বনের হরিণ বাগান বাড়িতে আর তিন কোটি টাকার গাড়ি ডাস্টবিনে। দুর্নীতির ফিরিস্তি দেয়া এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমরা খানিকটা গভীরে আলোচনা করতে চাই। খুঁজে বের করতে চাই দুর্নীতির আসল উৎস। তবে তার আগে কয়েকটি ভিন্ন রকম দুর্নীতির কথা আলোচনা না করলেই নয়।

১.

বাংলাদেশে মোলা মৌলভীদের সমালোচনা বহুদিনের। বলা হয় তারা কোন উৎপাদনশীল কাজে জড়িত নয়। তারা ভাল কথা বলে, ওয়াজ নছিহত করে, কারণ সেটাই তাদের পেশা। সমালোচকরা বলেন, এসব মোলা মৌলভীর যদি বেতন ভাতা বন্ধ হত অথবা ওয়াজ শেষে হাদিয়া দেয়া না হতো তাহলে তারা সদুপদেশ দেয়া বন্ধ করে দিতো। কিন্তু আমরা দেখি এসব মোলা মৌলভীর তথাকথিত কর্মহীনতার সমালোচনায় যারা মুখর তারাই দুর্নীতি দমনের উপদেশ দেয়াকে পেশা হিসাবে নিয়েছেন। টি আইবি, সিপিডিসহ বিভিন্ন এনজিওর যে সব বক্তা উপদেশ দেয়ার মহৎ কর্মটি করছেন তারা সবাই কি অন্য কোন বৈধ পেশায় আয় রোজগার করে দেশের কল্যানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছেন? নাকি কেউ কেউ বেতন ভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে বর্তমানে এ কাজটি করছেন (যারা অন্যত্র চাকরী করলে অন্য রকম কিছু করতেন)। যারা প্রফেশন হিসাবে উপদেশ দেয়াকে বেছে নিয়েছেন তারা যখন একই প্রফেশনের অন্যকে (যেমন মোলা মৌলভীদের) সমালোচনা করেন তখন তা নীতির পর্যায়ে পড়ে না, দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে।

২.

বাংলাদেশে কয়েকজন প্রখ্যাত সিভিল ব্যক্তি আছেন। যারা কখনো সিভিল সোসাইটির হয়ে রাজনীতিবিদদের তুলোধূনো করেন আবার কখনো কখনো নিজেরাই রাজনৈতিক দলের সভাপতি হিসাবে মাঠ গরম করার ব্যর্থ চেষ্টা চালান। তাদের কেউ কেউ তেল গ্যাস রক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি লুণ্ঠনকারী বহুজাতিকের হয়ে দক্ষভাবে মামলা লড়েন এবং রাষ্ট্রের বেচারা আইনজীবিদের সাফল্যের সাথে ধরাশয়ী করেন। তাদেরকে প্রশ্ন করতেও মিডিয়া ভয় পায়। এ ধরনের ব্যক্তিরা যখন নিজেদেরকে সৎ ও দেশ প্রেমিক দাবি করেন তখন কি তা দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে না? অবশ্য যখন যে পাত্রে রাখা হয় তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করা যদি কারো নীতি হয় তাহলে তা ভিন্ন কথা কেননা সেক্ষেত্রে দুর্নীতি সজ্ঞায়িত করা বড় কঠিন।

৩.

বাংলাদেশে সিগারেটের বিজ্ঞাপনের নীচে একটি কথা লেখা থাকে   “ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।” ইদানিং লেখা থাকে “ধুমপানে ষ্ট্রোক হয়।” এই কথা দুটো লেখায় সরকার, কারণ সরকার বিশ্বাস করে ধুমপান ক্ষতিকর। ধুমপান ক্ষতিকর

হলে স্বাভাবিকভাবেই তামাক ও তামাক জাতীয় পণ্যের উৎপাদন বিপনন ইত্যাদিও ক্ষতিকর। কিন্তু সিগারেট বিড়ির ব্যবসা বাংলাদেশের একটি বড় ও বৈধ ব্যবসা। সরকার এটা থেকে বড় অঙ্কের ট্যাক্স পায় বলে এটাকে বৈধতা দিয়েছে। তার মানে দাঁড়ায় টাকা দিলে ক্ষতিকর কিছুও বৈধ। এটা নীতি হতে পারে না; এটা দুর্নীতি। অবশ্য পুঁজিবাদে নীতি আর দুর্নীতির মাপকাঠি খুবই আপেক্ষিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক লাভালাভ নীতির মাপকাঠি স্থির করে। পশ্চিমা দেশগুলোতে পতিতালয় ও মদের ব্যবসা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ বিষয়ে একটু পরেই আসছি।

৪.

সম্প্রতি সরকারের একজন মুখপাত্র বলেছেন- বাংলাদেশের গ্যাস ২০১১ সালে শেষ হয়ে যাবে। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সিএনজি স্টেশনগুলোতে গ্যাস পাবার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সরবরাহ লাইনে গ্যাসের চাপ না থাকায় গ্যাস নিতে প্রতিটি গাড়ির অনেক সময় লাগে তাই এই ভোগান্তি। এছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় সিএনজি স্টেশনের সংখ্যাও অপ্রতুল। কেননা লাইনে চাপ না থাকায় সংশিষ্ট প্রকৌশলীরা নতুন মেশিনের অনুমতি দিতে চান না। এরই মধ্যে একটি মহল বিদেশী কোম্পানীর কাছে গ্যাস বিক্রি করতে নানা তত্ত্ব হাজির করছে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিপদগ্রস্ত করে যারা দেশের সম্পদ অন্যের হাতে তুলে দিতে চায় তাদের কাজ কর্ম কথা বার্তাও যে সুনীতি নয় তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হবার দরকার নেই।

দুর্নীতিতে ক্ষতি কার?

মানুষ দুর্নীতি কেন করে কিংবা দুর্নীতি কিভাবে স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রনে আনা যায় তার আলোচনার পূর্বে দুর্নীতি হলে আমাদের কী কী সমস্যা হয় সে বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

১. দুর্নীতির কারণে সমাজে অসম ও অন্যায্য বন্টন হয়। ফলে দেখা যায় ফুটপাতে শুয়ে থাকা মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত টিন দিয়ে অন্য কেউ ক্লাব ঘর তৈরি করে।

২. দুর্নীতির কারণে হয়রানি বাড়ে। দুর্নীতিবাজরা টাকার জন্য সেবা প্রার্থীকে নানাভাবে নাজেহাল ও অসহযোগিতা করে। প্রত্যেকটি কাজের ব্যয় বেড়ে যায়।

৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তির অধিকারে চলে যায়, ফলে জনগণের সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসে।এ ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজদের প্রধান টার্গেট খনিজ সম্পদ ও ভূমি।

৪. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত টাকা বাজারে মূল্য স্ফিতির সূচনা করে। পণ্য মূল্য বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষের আপেক্ষিক ক্রয় ক্ষমতা কমে।

৫. দুর্নীতির কারণে সেবা খাতের দক্ষতা এবং সামর্থ্য কমে যায়। জনগণ অত্যাবশ্যকীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। বিদ্যুৎ খাতের দুর্নীতি ও তার কারণে সৃষ্ট ধ্বংসোন্মুখ পরিস্থিতি এর জলন্ত উদাহরণ। পানি-গ্যাস-টেলিফোন-সরকারী-হাসপাতাল-বিমান ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগনের বঞ্চনা ও ভোগান্তির মূল কারণ দুর্নীতি।

৬. দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্র বিরাট অঙ্কের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়; ফলে জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।

৭. দেশের সম্পদ অপচয়ের একটি বড় কারণ দুর্নীতি। সংশিষ্ট দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের কারণে রাস্তাঘাট বাঁধ ইত্যাদি নিম্নমানের উপকরণে তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে অতি অল্প সময়ে ভেঙে যায়। এভাবে প্রতি বছর সরকারের কোটি কোটি টাকা গচ্চা যায়, যা পরবর্তীতে জনগণের উপর করের বোঝা বাড়ায়।

৮. দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অযোগ্য ব্যক্তিরা আসীন হয়। যারা তাদের অযোগ্যতার কারণে সমস্ত ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে ফেলে। পিএসসি-র সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড তারই প্রমাণ।

৯. দুর্নীতির মাধ্যমে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সমাজে অসুস্থ প্রতিযোগীতার জন্ম হয়। সমাজে সন্ত্রাস ও মাদকের বিস্তার ঘটে। মানুষের বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি একটি বড় বাধা; ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার প্রবনতা সৃষ্টি হয় যা এক সময় সমাজ কাঠামোকেই নড়বড়ে করে দেয়।

১০. দুর্নীতি একটি দেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও মারাত্মক হুমকি।

এভাবে দুর্নীতির হাজারটা কুফল বর্ণনা করা যায় তবে এই অন্যায়ের সব চেয়ে বড় কুফল বোধহয় আত্মসম্মানবোধের ধ্বংস। এটা এমন একটা ক্ষতি যা ব্যক্তি, সমাজ এবং ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়।

দুর্নীতির জন্য কারা দায়ী?

অনেকে খুব সহজেই বলে ফেলবেন যে আমাদের সমাজের বর্তমান দুর্নীতি গ্রস্থ অবস্থার জন্য দায়ী আমাদের রাজনীতিবিদরা। একথাও বলা হবে যে, পরিরিস্থিতির কাছে আমরা নিতান্তই অসহায়। যখন আমাদের রাজনীতিবিদরা ভাল হয়ে যাবে তখন সম্পূর্ণ সমাজ ভাল হয়ে যাবে। এটি অত্যন্ত সাদামাটা বিশেষণ এবং দুর্ভাগ্যজনক হলো ব্যাখ্যাটি খুবই স্বল্প চিন্তার মাধ্যমে প্রদত্ত। আর এই দুর্বল চিন্তাটি দিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে বর্তমান সরকারের মত অতি শক্তিশালী সরকারও। তারাও কিছু দুষ্ট লোককে শায়েস্তা করেই দুর্নীতির মত একটি ব্যাপক সামাজিক প্রবণতাকে রুখে দিতে চাইছেন। বস্তুতঃ জাতি হিসাবে আমরা যদি সমস্যাটির ব্যাপকতা ও গভীরতা বুঝতে পারতাম তাহলে সরকারের চলমান কার্যক্রমে এত বাহাবা দিতে পারতাম না।

আসল কথা হল এসব ক্ষমতা লিপ্সু সুবিধাভোগী রাজনীতিবিদ এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই ফসল। আমাদের মধ্য থেকেই তাদের উদ্ভব। আমাদের সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ যেমন লোভ, স্বার্থ-অহংকার, খ্যাতি ইত্যাদি দ্বারা তারা পরিচালিত। তারা হয়তোবা এমন একটি অবস্থানে থাকে যার কারণে তারা এসব মূল্যবোধ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করতে পারে অথবা তাদের কৃতকর্মগুলো বেশি আলোচিত হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হল সমাজ সামগ্রিকভাবে এসব মূল্যবোধ লালন করছে। নোংরা কলুষিত মূল্যবোধে লালিত সমাজ থেকে সৎ এবং জনগণের জন্য নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদ তৈরি করা বাস্তবিকই অসম্ভব।

আসলে সমাজের মানুষের দুর্নীতির পেছনে রয়েছে সমাজকে পরিচালনাকারী চিন্তা মূল্যবোধ ও রীতিনীতি। আমাদের সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদী দুষ্ট চিন্তা চেতনা ও আদর্শই জাতি হিসাবে আমাদেরকে দুর্নীতিবাজ করে তুলছে। ব্যক্তি একটি প্রোডাক্ট মাত্র, সমাজ হচ্ছে তার কারখানা।

দুর্নীতির প্রবণতা কিভাবে তৈরি হয়?

আজকের সমাজে সফলতার মাপকাঠি হল বৈধ অবৈধ যেকোন উপায়ে সম্পদশালী হওয়া এবং সর্বোচ্চ ভোগ বিলাস করা। ব্যক্তি স্বার্থ, লোভ, ক্ষমতা, সামাজিক প্রতিপত্তি ইত্যাদি আজকের সমাজের মানুষের জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। কোন কাজ করা বা না-করার মাপকাঠি হচ্ছে লাভ এবং ফুর্তি। মানুষ যদি কোন কাজে লাভ দেখে কিংবা ফুর্তি অনুভব করে তাহলে কাজটি করে অন্যথায় সেটি করে না। যে কাজে মানুষ মজা পায় তাই সে করে, এতে সমাজের উপর কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা চিন্তাও করে না। যারা ঘুষ নিচ্ছে তারা যেমন নিজের স্বার্থে তা করছে তেমনিভাবে যারা ঘুষ দিচ্ছে তারাও নিজের লাভের জন্যই তা করছে। ভোটাররা টাকার বিনিময়ে ভোট দিচ্ছে কিংবা সেই প্রার্থীকেই ভোট দিচ্ছে যে কিনা ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে। প্রার্থী কি খুনী, সন্ত্রাসী, চোরাকারবারী না লম্পট এসব এখন আর ভোটারদের বিবেচ্য বিষয় নয়। অপর দিকে রাজনীতিবিদরা ভোটে দাঁড়াচ্ছে নিজের অবস্থানকে আরো উন্নত ও পাকা পোক্ত করার জন্য। অতএব ভোটার এবং প্রার্থী উভয়েরই একই মাপকাঠি – নিজের স্বার্থ। দুর্নীতিবাজ ধনকুবেরদের সাথে আত্মীয়তা কিংবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকলে সাধারণ মানুষও এখন আত্মপ্রস্বাদ এবং গর্ব অনুভব করে।

সমাজের প্রত্যেক মানুষই যদি কেবল নিজের স্বার্থের জন্য কাজ করে তাহলে আমরা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করবো কীভাবে? আমাদের মধ্যে অনেকেই এসব সামাজিক সমস্যার ব্যাপারে নির্লিপ্ত এবং সমস্যা থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে আগ্রহী। তারাই সাধারণত সব দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে নিজের দায় দায়িত্ব অস্বীকার করতে চান। অনেকের জন্য সামাজিক সমস্যাগুলো চায়ের টেবিলের আড্ডার বিষয় মাত্র। তারা এই সমস্যাগুলোকে ততটাই গুরুত্ব দেন যতটা তারা দেন ক্রিকেট কিংবা নাটক সিনেমার খবরকে। কেউ কেউ আবার এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার আশায় দেশ ত্যাগ করে প্রবাসী হবার চেষ্টায় রত। এসবই দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক এবং আমাদের আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনাকেই ফুটিয়ে তোলে। আমাদের খারাপ অবস্থার জন্য রাজনীতিবিদদের দায়ী করা খুব সহজ। আমরা দেখছি কোন কাজ করার জন্য রাজনীতিবিদরা যে মাপকাঠি অনুসরণ করেন তাহলো নিজের লাভ। তেমনিভাবে সবকিছুতেই অন্যের উপর দোষ চাপানো এবং নিজেকে সব দায় দায়িত্বের উর্ধ্বে রাখার পেছনে যে মানসিকতা কাজ করে সেটাও আর কিছু নয়-নিজের স্বার্থ। আমরাও নিজের সম্পদ এবং অবস্থা উন্নয়নেই সর্বদা ব্যস্ত। আমরা সমাজ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাও করি না; কোন সমস্যা সমাধানের দায়িত্বও নিজেরা নিতে চাই না। কারণ আমরা মনে করি এতে করে আমাদের মূল্যবান সময়, চাকরি, ব্যবসা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি ক্ষতি হতে পারে। আমরা যদি আত্মসমালোচনা করি তা হলে দেখতে পাবো

শীর্ষ দুর্নীতিবাজদের মনমানসিকতার সাথে আমাদের মনমানসিকতার তেমন কোনো ফারাক নেই। স্পষ্টত: এ ধরনের মানসিকতা দিয়ে যদি কোন সমাজ পরিচলিত হয় তাহলে সে সমাজের অবস্থা খারাপ হতে বাধ্য।
সমাজের প্রত্যেক মানুষই যদি শুধু নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজ করে তাহলে পারস্পরিক স্বার্থের মধ্যে টানাপোড়ন এবং সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে এবং স্বার্থ উদ্ধারের জন্য শেষ পর্যন্ত মানুষ ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, খুন খারাবি ইত্যাদিতে লিপ্ত হবে।

সমাধান কোন পথে?

এত সব বলার পরও অনেকে বলতে চাইবেন কঠোর শাসনই আমাদের জন্য একমাত্র সমাধান। তারা এমন একজন নেতার কথা চিন্তা করেন যিনি জনগণকে সোজা করে দিবেন। বস্তুত: এধরনের এক নায়কতন্ত্রের ধারণা কেবল হতাশা থেকেই জন্ম নেয়। কোন ব্যস্ত চৌরাস্তার যানজট মোকাবেলায় কিংবা চোরাই টাকা উদ্ধারে আইনের কঠোর প্রয়োগে যে সাময়িক সমাধান পাওয়া যায় তার সাথে জটিলতর এবং ব্যাপকতর সামাজিক সংকটকে এক করে দেখা ঠিক হবে না। যে আইনের কোন ব্যাপক ভিত্তিক গ্রহণযোগ্যতা নেই একটা বিশাল জাতি গোষ্ঠিকে সেই আইন মানতে বাধ্য করা যায় না। জনগণ এবং সমাজ একদল দুষ্টু শিশু নয়। স্বৈরতন্ত্র আরও বিভক্তি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশী রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তাই স্বৈরতন্ত্র তথা জুলুমের শাসনের ব্যর্থতাও অবশ্যম্ভাবী।
কোন সমাজকে ভালভাবে চলতে হলে এবং উন্নতি করতে হলে সেই সমাজে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি এবং আদর্শ থাকা প্রয়োজন যার ভিত্তিতে সমাজের দৈনন্দিন সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সমস্যা ও চাহিদা মোকাবেলা করা যায়। আর সমাজের উপর এসব নীতি আদর্শ ও চিন্তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে চাইলে জনগণকে অবশ্যই এসব বিষয় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং মেনে নিতে হবে। সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি একক চিন্তার উপর যদি কোন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই চিন্তার ভিত্তিতে যদি সমাজের সব সমস্যা সমাধান করা যায় তাহলেই কেবল সমাজ গতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ হতে পারে।
কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমন কোন নীতি বা আদর্শ নেই যার উপর সমগ্র সমাজ বিশ্বাসী এবং একমত। আমরা এক গাদা চিন্তা ভাবনা লালন করি যার কিছু এসেছে উত্তরাধিকার সূত্রে আর বাকিটা এসেছে অন্যের অনুকরণের মাধ্যমে। এমন কোন একক চিন্তার উপর ঐক্যমত্য নেই যার উপর ভিত্তি করে আমরা জীবন চালাতে পারি এবং সমাজ পরিচালনা করতে পারি। ফলে সমাজে চলছে চিন্তা ও আদর্শের নিরন্তর সংঘাত আর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ক্রমশঃ সুদূর প্রসারী কিংবা গভীর চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের ধান্দা ও তাৎক্ষনিক লাভালাভের প্রতিযোগিতায় নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমরা কেউ কেউ কিছু কিছু ইসলামী চিন্তা ধারণ করি যা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং আমরা নিজেরা কখনো চিন্তা করে দেখিনি কেন আমরা এসব বিষয় বিশ্বাস করি। অনেকে আবার পশ্চিমা বিশ্বের তথাকথিত উন্নতি দেখে মুগ্ধ এবং তাদের সমাজে প্রচলিত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সুশাসন, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি চিন্তার অনুসারী। বস্তুত: এসব পশ্চিমা চিন্তাও আমরা অনুকরণ করছি অন্ধভাবে আর ভেবে দেখছি না এগুলো আমাদের জনগণের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং চাহিদার সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ। উপরন্ত পশ্চিমাদের কাছ থেকে যাই আসুক ভালমন্দ বিচার না করে তাই গ্রহণ করা অনেকের কাছে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মূল্যবোধ আর অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে লব্ধ পশ্চিমা চিন্তাধারার অসম্ভব মিশ্রণের ফলেই আজকের এই বিচ্যুত, বিশৃঙ্খল, বহুমুখী, স্থবির সমাজের জন্ম হয়েছে। আদতে আমরা কোনো রকম নীতি আদর্শকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করছি না। ফলে নীতিহীনতা বা নীতিবিচ্যুতি আমাদের জন্য কোনো কঠিন বিষয় নয়। এ ধরনের একটি সমাজের পক্ষে দুর্নীতি কেন কোনো সমস্যাই কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সমাজ যেহেতু কোন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সমস্ত মানুষের চিন্তা ভাবনাকে এক করতে পারছে না সেহেতু সমাজে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সকল সমস্যা বেড়েই চলেছে। আমাদের সমাজের প্রচলিত চিন্তা সেটা ইসলামী কিংবা পশ্চিমা পুঁজিবাদী যাই হোক না কেন কোনটার ব্যাপারেই আমাদের কোন আস্থা নেই কেননা আমরা এগুলোর ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেই নি বরং অন্ধভাবে নকল করছি মাত্র, ফলে আমাদের সমাজে যখনই কোন সমস্যা হয় আমরা সমাধানের জন্য পশ্চিমা বিশ্ব কিংবা তাদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠন যেমন বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ ইত্যাদির পেছনে ভিক্ষুকের মত ঘুরতে থাকি। এখন চলছে তাদের সমর্থন ও পরামর্শ অনুযায়ী দুর্নীতি দমন।

ধার করা সমাধান যে কতটা অকার্যকর তা গত পনের বছরের বাংলাদেশের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তথাকথিত গণতন্ত্রের অনুশীলন আর পশ্চিমাদের প্রদত্ত নীতির অনুসরণ এদেশের মানুষের একটি মৌলিক সমস্যারও সমাধান দিতে

পারে নি। দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, গাড়ী ইত্যাদি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে মানুষের নিরাপত্তাহীনতা আর দুর্ভোগ। উপরন্ত বিভিন্ন শর্ত আর ঋণের বেড়াজালে পড়ে আমরা পরিনত হয়েছি পশ্চিমা পুঁজিবাদের দাসে। আমাদের কপালে জুটেছে পর পর পাঁচ বার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের খেতাব।

জাতির এই সংকটময় মুহুর্তে আমাদেরকে এমন একটি প্রক্রিয়ার সূচনা করতে হবে যা দিয়ে আমরা এমন কিছু চিন্তা এবং নীতিতে উপনীত হতে পারি যে গুলোর উপর আমাদের বিশ্বাস এবং আস্থা আছে এবং যা দ্বারা এ দেশের জনগণ শাসিত হতে ইচ্ছুক। অন্তত: আমরা যারা সমাজের ব্যাপারে সচেতন তাদের উচিত একটা চিন্তার পরিবেশ তৈরি করা যাতে করে আমরা আমাদের সমাজের প্রচলিত চিন্তাগুলোকে প্রশ্ন করতে পারি, সেগুলোকে আর একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারি এবং প্রকৃত সত্য খুঁজে পেতে পারি। ভাসা ভাসা চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে কোন ধারণাকে গ্রহণ করা উচিত হবে না। বরং আমরা সে সব উপায়কেই গ্রহণ করতে পারি যেগুলোর দৃঢ় বুদ্ধিবৃত্তিক (ওহঃবষষবপঃধষ) ভিত্তি রয়েছে এবং যা দ্বারা আমাদের সমস্যার সামগ্রিক সমাধান সম্ভব।

আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আমাদের সমাজে ব্যাপক পরিসরে প্রচলিত ব্যক্তিগত স্বার্থ ও খেয়াল খুশির এই দুষ্ট মূল্যবোধের পেছনে রয়েছে পুঁজিবাদী আদর্শ। এই আদর্শের বিভিন্ন কনসেপ্ট আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করছে। পুঁজিবাদের আইন কানুন ও সংস্কৃতি আমাদেরকে প্রতিনিয়ত দুর্নীতি পরায়ণ ও অপরাধের প্রতি আগ্রহী করে তুলছে। পুঁজিবাদী আদর্শটাই এমন যা চায় সম্পদের প্রয়োজনে সমস্ত নিয়ম কানুন সমাজে আসবে বা যাবে। মানুষ, মানুষের অধিকার, মানুষের পরিণতি তার কাছে কোনো বিষয় নয়। পুঁজিবাদ তার দুষ্ট নীতিগুলোকে মানুষকে সহজে গেলানোর জন্য প্রথমে ব্যক্তিকে পারিবারিক ও সামাজিক রীতি নীতির বাইরে নিয়ে আসে পরে তাকে নানা রকম লোভের ফাঁদে ফেলে সৎ চিন্তা ও মূল্যবোধের বিপরীত কাজগুলো করতে প্রলুব্ধ করে। বিশ্ব বাজারে পুঁজিবাদের প্রতিনিধিত্বকারী বহুজাতিক কম্পানীগুলো সব সময় এই কাজে সক্রিয়। তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে সব সময় সেকুলার করতে চায় কেননা সেকুলার ব্যবস্থা ধারণাগতভাবেই স্রষ্টা,পরকালে বিচার, দোজোখ-বেহেস্ত ইত্যাদি অতি শক্তিশালী ও স্থির বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন । এই দুষ্ট ধারণাটির সুবিধা নিয়ে সম্পদের প্রয়োজনে যেকোন আইনকে সংশোধন করা যায় এবং দুর্নীতিকে বৈধতা ও সমর্থন দেয়া সম্ভব হয়। সমাজ যদি স্রষ্টা প্রদত্ত স্থির তথা সত্যিকারের ন্যায়পূর্ণ নিয়ম-কানুন দ্বারা শাসিত হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্তরে দুর্নীতিগুলো এমনিতেই দূরিভুত হয়ে যায়। তার উপর ব্যক্তির মূল্যবোধ যদি স্রষ্টার পছন্দ-অপছন্দ ও পরকালের জবাবদিহিতার ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে তাহলে ব্যক্তি স্তরের দুর্নীতিও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। একটি সমাজে মানুষ যখন স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক জানতে জানতে বেড়ে ওঠে তখন আত্মকেন্দ্রিকতা কোনভাবেই প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায় না। ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, বিচারক নির্বিশেষে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ তখন তার নিজের ও পাশের অন্য মানুষদের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়।

অতএব আমরা যদি দুর্নীতিকে সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই পুঁজিবাদী চিন্তা ও নিয়ম কানুন ঝেড়ে ফেলে তার জায়গায় স্রষ্টার সাথে সম্পর্কীত চিন্তা মূল্যবোধ ও আইন কানুন গ্রহণ করতে হবে। এর কোনই বিকল্প নেই।

ধানমন্ডি, ঢাকা ০২.০৬.০৭